# ভারতীয় সংস্কৃতির গোড়ার কথা : সংস্কৃতির স্বরূপ

প্রাবন্ধিক অমূল্যচরন বিদ্যাভূষন তথ্যনিষ্ঠ যুক্তিবাদী প্রাবন্ধিক। 'ভারতীয় সংস্কৃতির গোড়ার কথা' প্রবন্ধটি ১৩৪২ সালে 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, তার পঁচিশ বছর পর ১৩৭২ সালে তুলনান্নটি প্রবন্ধের সংকলন গ্রন্থ ড: সুশীলকুমার দে গুপ্ত সম্পাদিত ভারতীয় সংস্কৃতির উৎস ধারায় এই প্রবন্ধটি অন্তর্ভুক্ত হয়। প্রথমেই প্রাবন্ধিক ভারতীয় সংস্কৃতির গোড়ার কথা আলোচনা করতে গিয়ে প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানবজাতির কথা বলেছেন, প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকেই মানবজাতি অনেকগুলি শ্রেনীতে বিভক্ত হয়েছে, আর্য, নিগ্রো, মঙ্গোলিয়ান প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিভাগের পশ্চাতে হতত্বও বিশেষ কোনো তত্ত্বাদ দিতে পারে না। এদের নিজস্ব সংস্কৃতি ও সভ্যতা আছে, ভৌগলিক অবস্থানের ফলে দীর্ঘযুগ যাপন করেও বিভিন্ন খন্ড খন্ড মানব সমাজ এক একটি সংস্কৃতি তথা সভ্যতা বিশিষ্ট সত্ত্বা নিয়ে গড়ে উঠেছে। সেই মানবসমাজের আকৃতি ও প্রকৃতিকে অস্বীকার করা যায় না।

একটা জাতিকে সমগ্র মানবজাতী থেকে পৃথক নামে অভিহিত করার পিছনে একটা নীতি আছে। মনুষ্যসমাজ থেকে এক একটি অংশ সমগ্র পৃথিবী থেকে খন্ড খন্ড অংশ হয়ে বাস করছে। এক একটি অংশের রীতিনীতি, সংস্কৃতি সবকিছু আলাদা, অনুষ্ঠান পদ্ধতি আলাদা। তা সত্ত্বেও এদের পরস্পরের মধ্যে ঐক্য বা মিল দেখা যায়, এক জাতি যা ভাবছে, অন্য জাতিও হয়তো একই ভাবনা ভাবছে, এক জাতির সমস্যা হয়তো অন্য জাতির সমস্যার সঙ্গে মিলে যায়, সমাধানটাও মেলে। কিন্তু এক একটি জাতির চিন্তাধারা ও সমাধানের ধারায় বিভেদ থেকে যায়, সেখান থেকেই এক জাতির থেকে আর এক জাতির বিভেদ রেখা সৃষ্টি হয়,

পৃথিবীর সকল প্রাচীন সভ্যতার পরিচয় আজও ইতিহাসের পৃষ্ঠায় খুঁজে বার করতে হয়। আধুনিক প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গন নতুন সভ্যতার মধ্যে প্রাচীন সভ্যতার বীজ আবিষ্কার করেছেন। এক সময় মিশর, ব্যাবিলন, অ্যাসিরিয়া প্রভৃতি সভ্যতা ইতিহাসবিখ্যাত ছিল। এমনকি ঐসব সভ্যতার

সঙ্গে তুলনা করা চলে গ্রীক ও রোমান সভ্যতাকেও। কিন্তু সমস্ত সভ্যতাই আজ প্রত্নতাত্ত্বিক হয়ে গেছে।

সকল প্রাচীন সভ্যতার মধ্যে একটি মাত্র সভ্যতা বেঁচে আছে, সেই অদ্বিতীয় গৌরবের স্থান ভারতীয় সভ্যতার। বৈদিক সভ্যতা বলতে যা বোঝা যায় তা ভারতীয় সভ্যতার একটি বিশিষ্ট পরিণতি। অন্য দেশে, অন্য জাতির সংমিশ্রণে এক বিচিত্র রূপ।

অন্য দেশ, অন্য জাতি, অন্য সভ্যতার ভারতীয় সভ্যতার মতো এত গভীরতা এবং ব্যাপকতা ছিল না। লেখক লিখেছেন "যে সকল সভ্যতার সমস্যা ছিল সাময়িক, তাহাদের চিন্তা বর্তমানকে অতিক্রম করতে পারেনাই," প্রাণহীন বস্তুসভ্যতা বেঁচে থাকতে পারে না। অন্তরজীবনের গভীর কোনো পরিচয় অন্যান্য সভ্যতায় নেই যা ভারতের মধ্যে আছে, ভারতীয় সভ্যতার প্রাণস্পন্দন ছিল বলেই সে বেঁচে আছে, একে 'আধ্যাত্মিক' বলে কোনো কোনো বিদেশী পণ্ডিত ব্যঙ্গের হাসি হেসেছেন। মনে রাখতে হবে ভারতীয় সভ্যতার মধ্যে আত্মা আছে তাই তার মৃত্যু নেই, সে অবিনশ্বর।

ভারতীয় সভ্যতার সংস্কৃতির চিন্তাধারা পার্থিব বস্তুতেই নিঃশেষ হয়ে যায় না, বস্তুর আশ্রয়ে যা বস্তুর অতীত তারই সন্ধান এখানে পাওয়া যায়, ভারতের সভ্যতা চিরকালই রূপের মধ্যে অরূপের সন্ধান করেছে, নশ্বরতাকে অতিক্রম করে ভারতের সাধনা হয়েছে শাশ্বত নিত্যের, এই জগতে প্রাণ থেকে প্রাণের সন্ধানে তার যাত্রা, অমৃতের পথই তার চলার পথ, ভারতের সভ্যতা জীবনের দীর্ঘ সাধনার সভ্যতা। এই সাধনা অবিদ্যা থেকে মুক্তির সাধনা, বিদ্যার আবির্ভাবের সাধনা।

ভারতবর্ষে শিক্ষা ও সংস্কৃতির কোনোদিন একবস্তু নয়। সংস্কৃতি ভারতের অন্তরের বস্তু, শিক্ষা বা অক্ষর পরিচয়ের সঙ্গে, সাহিত্যজ্ঞানের সঙ্গে, বিজ্ঞানের জ্ঞানের সঙ্গে তার নিবীর যোগসূত্র নেই, ভারতবর্ষে বিদ্যা কখনও academic হতে পারে না, বিদ্যা তার অন্তরের সামগ্রী। দর্শন কখনও বুদ্ধির পরিচয় জ্ঞাপক হয় না। দর্শনও ভারতবাসীর কাছে প্রাণস্বরূপ। "ধর্মের গোড়ার কথাটি হইয়াছে সর্ববস্তুর মধ্যে একটা অখণ্ড যোগ; সর্ববস্তু একটি অখণ্ড পূর্ণত্বের একাংশমাত্র।" প্রাবন্ধিক যথার্থভাবেই এই উক্তি করেছেন। লেখক আরও লিখেছেন তার macrocosm ও microcosom সর্ববিদ্যাই ধর্মের মধ্যে বলে স্বীকৃত হয়েছে। এমনকি চতুঃষষ্টি শিল্পকলাও ধর্মের বাহন হয়েছে, শিল্পকলা গ্রন্থেরও তাই নাম হয়েছে শাস্ত্র। ধর্মের মত ব্যাপক শব্দ ভারতীয়

ভেদায় তার নেই। সর্ববিদ্যার শেষবাণী হল ধর্ম। তাদের মধ্যে কোনো বিদ্বেষ ঘটেনি। অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন— "ভারতের সাধনা Concrete এর মধ্য দিয়ে abstract এ; রূপের মধ্য দিয়ে অরূপের"। লিঙ্গপূজার মধ্য দিয়েই আমরা এই অরূপপূজার সাক্ষ্য পাই। আমরা এই মূর্তিপূজার অবিকল নিছক মনুষ্যমূর্তি যে আমরা দেখি না তার কারণ যে abstract এর মূর্তি দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে, তা Concrete এর হুবহু নকল হতে পারে না।

প্রাচীনকাল থেকেই পরিব্রাজকদের কথা শুনতে পাওয়া যায়, চিরপথিক তাঁরা, দেশদেশান্তরে বিরামহীন যাত্রার ব্রত তাঁরা গ্রহণ করেছেন। তাঁদের সাধনার ফল তারা প্রচার করেছেন। দরিদ্রের কুটির থেকে রাজার প্রাসাদ পর্যন্ত তাদের সর্বত্র গতি। প্রাচীন যুগে গ্রামে গ্রামে ছিল পরিব্রাজকের জন্য কুটাইলশালা। কুটাইলশালার প্রকৃত নাম কুতূহলশালা অর্থাৎ কৌতূহল শালা, যেখানে বসে তারা গ্রামে গ্রামে সংগৃহীত তথ্যের আলোচনা করতেন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। সেখানে বসত বিচারসভা তারা গ্রামবাসীদের উপদেশ দিতেন। রামায়ণ- মহাভারত ভারতবর্ষকে গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিলেন। ভারতবাসীদের অন্তরে প্রাণের সঞ্চার করেছেন। ভারতের অষ্টাদশ পুরাণকথা ভারতের মর্মকথা।

ভারতবর্ষে আর্যরা কেমনভাবে এল সে প্রশ্নের মীমাংসা আজও হয়নি, তবে আদিমতম যুগে কয়েকটি আর্য দেবতার সাক্ষ্য পাওয়া যায়। 'বোগাসকই' শিলালিপিতে, 'তেল- অল- অমরনার' পত্রাবলীতে এবং ব্যাবিলনের কাসাইটদের দলিলপত্রে কাসাইটরা হিমালয়ের উল্লেখ করেছেন। তেল- অল- অমরনার পত্রাবলীতে সংস্কৃত নাম আছে, বৈদিক শব্দের সঙ্গে এই শব্দের মিল আছে। ভারতবর্ষের সঙ্গে এশিয়া মাইনরের সাক্ষাৎ সম্পর্ক আছে। এই সমস্ত দূর দেশের হিন্দুদেবতারা শান্তিদেবতারূপে দেখা দিয়েছেন। শান্তির বাণী নিয়েই ভারতবর্ষের প্রথম আন্তর্জাতিক পরিচয়। শান্তিই ভারতের সনাতন বাণী, শান্তিই ভারতীয় সংস্কৃতির যথার্থ প্রতীক। সেই যুগে ভারতীয় সভ্যতা ছাড়া অন্যান্য সভ্যতা-গুলি যুদ্ধ আর লুণ্ঠনের সভ্যতা হয়ে উঠেছে, মিশর, গ্রীস, ব্যাবিলন এসব কিছুই শুধু রক্ত আর হত্যার হানাহানির ইতিহাস রচনা করেছেন।

মোহেঞ্জোদারো আর হরপ্পায় যে সভ্যতা পাওয়া গেছে তার

সঙ্গে সুমেরীয় সভ্যতার ঐক্য সামঞ্জস্য আছে। সুপ্রসিদ্ধ ইংরেজ প্রত্নতত্ত্ববিদ মার্শাল (Jurbould) সাহেব বলেছেন, সিন্ধু উপত্যকায় যে সভ্যতার সন্ধান পাওয়া গেছে তা অতি প্রাচীনতম সভ্যতা, তা ঐ স্থানেরই নিজস্ব সম্পত্তি; আর মেসোপটেমিয়ায় সুমেরীয় সভ্যতার যে পরিচয় পাওয়া গেছে তা থেকে কল্পনা করা যায় যে, ভারতবর্ষের অন্যপ্রদেশেই ঐ সভ্যতার আদিভূমি। ভারতীয় সংস্কৃতির দ্রাবিড়ীয় অংশের ইতিহাস আজও লিখিত হয় নি। কিন্তু এই ইতিহাসের প্রয়োজন আছে। দ্রাবিড়ী রক্তের মতো এই সংস্কৃতি আর্য সংস্কৃতির সঙ্গে মিশে গেছে। লিঙ্গপূজা, নাগপূজা, বৃক্ষপূজা, মাতৃকাপূজা প্রভৃতি এইসব দ্রাবিড়ীয় সংস্কৃতি থেকে আগত ধর্মই যত্রতত্র প্রতিমাপূজা, এটিও দ্রাবিড়ীয় বলে মনে হয়। বাস্তুই ভাষায় দ্রাবিড়ী ভাষা বা নেগ্রিটো গোষ্ঠী ভাষা হতে পারে।

বৈদিক যুগ থেকেই ইরানের সঙ্গে ভারতবর্ষের সম্বন্ধ। অশোকের সময় ভারতীয় সংস্কৃতিতে ইরান-সম্পর্কের নিদর্শন পাওয়া যায়। মহামতি অশোক যিনি মৈত্রীর বাণী প্রচার করেছিলেন তিনি সৌভ্রাতৃত্বের বাণীও প্রচার করেন। এর থেকে বৃহত্তম মানসিক ও আন্তর্জাতিক বাণী আর হতে পারে না। তিনি এই বাণীর দ্বারাই পৃথিবীকে জয় করেছিলেন। আর সেই বিজয়ের নাম তিনি দিয়েছিলেন ধর্মবিজয়। তিনি চেয়েছিলেন বিশ্বের কল্যাণ ধর্মের দ্বারা মানুষের অন্তরজয় তার ছিল একমাত্র কাম্য। আর সেই যুগেই গড়ে উঠেছিল বৃহত্তর রোমক সাম্রাজ্য ও রোমক সভ্যতা।

খ্রিস্টপূর্ব শতকে মেনেন্দরকে একাগ্র ও ঐকান্তিক বৌদ্ধরূপে দেখা যায়। বৈষ্ণব ও ভাগবতরূপে হেলিওডেরিসের পরিচয় পাওয়া যায়। চীনে বৌদ্ধ প্রচারক গেলে, তথাকথিত গান্ধার শিল্পে গ্রীক সংস্কৃতির নিদর্শন পাওয়া যায়। তার পরযুগের ইতিহাসেও পাওয়া যায় ভারতবর্ষ সকলকে গ্রহণ করেছে, কত অজ্ঞানকে জ্ঞান দিয়েছে। নিজের কত উৎকৃষ্ট সংস্কৃতি ও সভ্যতা অন্যকে দান করেছেন এবং অন্যের উৎকৃষ্ট সংস্কৃতি ও সভ্যতা নিজে গ্রহণ করেছেন। প্রাবন্ধিক লিখেছেন— 'এমন সময় গিয়াছে যখন ভারতে পর সংস্কৃতির একটা রাসায়নিক সংমিশ্রণ চলিয়াছিল।' মিশর, এশিয়া মাইনর, পারস্য সকলের সঙ্গে ছিল ভারতীয় সংস্কৃতির অন্তরঙ্গ যোগ। এছাড়া বহু অসভ্য বর্বর জাতি ভারতে হানা দিয়েছে। তারা অনেকেই দেশে ফিরে যায়নি। ভারতবর্ষ

শক, হুন, মোঙ্গল, পহ্লব, চীন সকলকেই নিজের মধ্যে গ্রহণ করেছে। ওরা ভারতবর্ষের নিজস্ব সংস্কৃতিকে নষ্ট করতে পারেনানি, বরং ভারতীয় জাতি ও সভ্যতা সংস্কৃতির দ্বারা তারা নিজেরাই প্রভাবিত।

—ভারতবর্ষের গৌরবময় ইতিহাসের একটি বিশিষ্ট কীর্তি এই রাজপুতরাণে। দ্রাবিড়ীয় অন্ধ্রসম্রাট গৌতমীপুত্র সাতকর্ণি নিজেকে এক ~~ব্রাহ্মণ~~ ব্রাহ্মণ বলে গর্ব করলেও চতুর্বর্ণের সংমিশ্রণ বন্ধ করেছেন বলে শিলালিপিতে অঙ্কন করলেন। শক উসভদাত, এবং রুদ্রদামা হিন্দুধর্মের প্রতিপালক ছিলেন। উসভদাত ছিলেন শক রাজা দিনীকের পুত্র, তার আদেশে নাসিকের একটি গুহার শিলালিপিতে একটি আদেশ উৎকীর্ন হয়েছিল। রুদ্রদামা ছিলেন সুবিখ্যাত শকরাজা, জুনাগড়ের একটি শিলালিপিতে তাঁর কীর্তিকলাপ পাওয়া যায়। এরা দুজনেই ছিলেন মানব প্রেমিক ও হিন্দুধর্মের প্রতিপালক শক হয়েও, সংস্কৃতির এমন বিরাট রাসায়নিক সংমিশ্রণ পৃথিবীর ইতিহাসে তেমন বড় ঘটে না। ভারতের উদারনীতিতে ভারতের সঙ্গে সর্বযুগের ঐতিহাসিক উপকরণ যুক্ত হয়েছে। বৃহত্তর ভারতে দেখা গেল এইসময় থেকেই বৌদ্ধধর্ম আগেই চীনে পৌঁছে গেছিলো, এইবার পৌছালো ব্রাহ্মণধর্ম, খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতকের শেষে বৌদ্ধধর্ম একইসঙ্গে ব্রাহ্মণধর্ম সর্ব্ব এশিয়ায় ছড়িয়ে পড়ল, ছড়িয়ে পড়ল জাপানে, তিব্বতে সর্বত্র। এইভাবে ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতা বিশ্ব-সংস্কৃতি ও সভ্যতার অগ্রদূত হয়ে উঠল,